গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

বর্ষ-১৬ সংখ্যা-৪ জুলাই-আগস্ট ২০১৯ RNI NO. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

ঘূর্ণিঝড় ফণী

অঙ্কন : সৌরভ মুখার্জী

মো. : ৯৮৩০৪৭০৩৩৪

❑ প্রচ্ছদ কথা : ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ফণী ২ ❑ মানবজীবনে মাকড়সার ভূমিকা ৬ ❑ মহিলা বিজ্ঞানী ৮ ❑ হর্স পাওয়ার ১০ ❑ খাদ্যের মাধ্যমে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমান ১১ ❑ অঙ্ক : জানা যখন অজানার গভীরে ১২ ❑ নতুন গবেষণা : হদিশ মিলল ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ১৩ ❑ মহাকাশ : চাঁদ কি ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে? ১৪ ❑ সংবাদ ১৫ ❑ জানো কি?/কবিতা ১৬

সুভাষিতম্

'মৃত্যুর পর আত্মার থেকে যাওয়ার ধারণা, যে আত্মা আমাদের ব্যক্তিত্বের নির্যাস এবং অসামান্য এক স্বর্গে প্রবেশের সম্ভাবনা—দুটোই আমার কাছে সান্তাক্লজের মতোই অবাস্তব—শিশুমনের বিশ্বাস।'

—**লুক মোঁতাইনিয়ে** *(এইডস ভাইরাস আবিষ্কারক, নোবেল বিজয়ী)*

আমাদের কথা : জয় বিজ্ঞান

১৯৯৯ সাল। বাতাসের সর্বোচ্চ বেগ ২৬০ কিমি/ঘন্টা। ভয়াল ভয়ঙ্কর ঝড় সুপার সাইক্লোন উড়িষ্যা উপকূল দিয়ে ধেয়ে গেল। সাথে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা। পরিণাম—প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিসহ ১২০০০ মানুষের মৃত্যু।

২০১৯ সাল। বাতাসের সর্বোচ্চ বেগ ২২০ কিমি/ঘন্টা। ভয়ঙ্কর ঝড় সুপার সাইক্লোন 'ফণী' উড়িষ্যা উপকূল দিয়ে ধেয়ে গেল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে এবার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কম হল। মৃত্যু কমে হল ৬২।

২০ বছরের ব্যবধানে দুটি ভয়ঙ্কর সুপার সাইক্লোন। দুটির মধ্যে অনেক কিছুতেই মিল পাচ্ছি। আশ্চর্যজনকভাবে অমিলও দেখা যাচ্ছে। অমিল মৃত্যুর সংখ্যায়। ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে। বিশেষত মৃত্যুকে অনেকটাই কমিয়ে আনা গেছে। এর কারণ কি? অনুসন্ধানে, বিজ্ঞানের দুর্দান্ত অগ্রগতিকেই প্রকাশিত হতে দেখছি।

সময়ের সাপেক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। স্বল্প পরিমাণ লিখিত তথ্যের পরিবর্তে সংখ্যা নির্ভর আঞ্চলিক আবহাওয়ার ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। পারস্পরিক ক্রিয়াশীল তথ্যের সমন্বয়ে বিপুল তথ্যভান্ডারের (Digital Forecast Database) সহায়তায় আবহাওয়াভাষ্যকে সুনির্দিষ্ট ও প্রায় ত্রুটিহীন করা এখন আর অসম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে মানুষও তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কার্যকারিতায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে মানছে। দেখা গেল সুপার সাইক্লোন ফণী ও তার আগমনের পূর্বাভাস মানুষের বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করল। মানুষ আবহাওয়া বিজ্ঞানে বিশ্বাস রেখে নিজেদের সতর্ক করল ও নিরাপদ স্থানে সুরক্ষিত করল।

অন্যদিকে চিরকালীন কাল্পনিক শক্তির রক্ষকের ভূমিকাও কি একটু টলে গেল না?

—তাপস মজুমদার

প্রচ্ছদ কথা

অ জ য় না থ

ক্রান্তিয় ঘূর্ণিঝড় ফণী

এপ্রিল মে মাস বর্ষা পূর্ববর্তী এবং অক্টোবর নভেম্বর মাস বর্ষা পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের সময়। এই সময় ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বিশেষ করে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ক্রান্তিয় ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এপ্রিল মে মাসে নিরক্ষরেখার আশপাশে বাতাসের অস্থিরতা তৈরি হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরতে থাকে। অনেক সময় দক্ষিণ চীন সাগর থেকে নিম্নচাপ অক্ষরেখা ভারত মহাসাগরের উপর সরে আসে। অনুকূল পরিবেশে নিম্নচাপ অক্ষরেখা ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে নিম্নচাপ ও নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। একটু বিস্তারিত ভাবে বলি। উত্তাপজনিত কারণে ক্রান্তিয় সমুদ্র অঞ্চলের কোথাও বাতাসের চাপ তার চারপাশের অঞ্চলের তুলনায় পাঁচ থেকে ছয় মিলিবার কমে গেলে সেখানে একটা নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়। যেহেতু বাতাসেও তরলের সমস্ত গুণ রয়েছে তাই নিম্নচাপের চারপাশের তুলনামূলকভাবে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বাতাসের প্রবাহ নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। নিম্নচাপের কেন্দ্রে কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রাতীগ বা বিপরীতমুখী বলের জন্য বাতাসে যে ভরবেগ তৈরি হয় তার ফলে বাতাস নিম্নচাপ কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে উপরের দিকে উঠতে থাকে। বাতাসের ঘুরতে ঘুরতে উপরের দিকে উঠে যাওয়াকে বলা হয় ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর গোলার্ধে বাতাস ঘোরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে। নিম্নচাপ অঞ্চলে বাতাসের চাপ কমতে থাকে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের চারপাশে বাতাসের গতিবেগও বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে ঘূর্ণাবর্তের উচ্চতাও যা পাঁচ ছয় কিলোমিটার থেকে নয় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে যায়। বাতাসের গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাতাসের স্থায়ী গতিবেগ ৬২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় পৌঁছালে বলা হয় নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। তখন ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া হয়। শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের তীব্রতার পরিভাষাও পরিবর্তিত হয়। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১১৯ হলে প্রবল (sever), ১২০ থেকে ১৮০ পর্যন্ত অতি প্রবল (Very Severe), ১৮১ থেকে ২১৯ কিলোমিটার পর্যন্ত হলে বলা হয় চরম প্রবল ঘূর্ণিঝড় (Extremely Severe Cyclonic Storm)। কোনও ঘূর্ণিঝড় এই স্তরে পৌঁছালে তার কেন্দ্রে একটি মেঘহীন অঞ্চল তৈরি হয় যার ব্যাস ৩০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে আই (চক্ষু বা

চোখ) অফ দি স্ট্রর্ম বলা হয়। বাতাসের গতিবেগ ২২০ বা তার বেশি হলে বলা হয় সুপার সাইক্লোন।

রিজ ঘূর্ণিঝড়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকে। সেক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পশ্চিমী বাতাসের

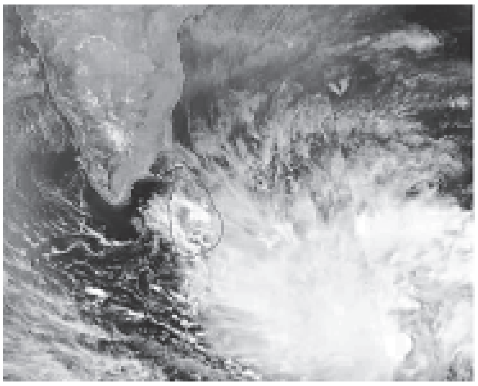
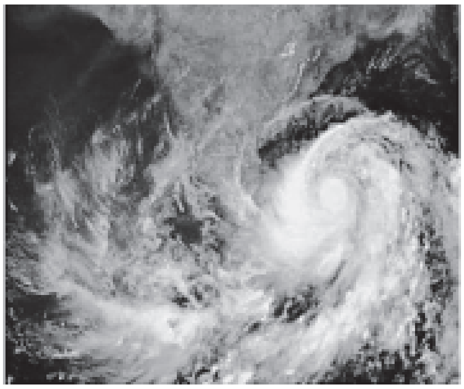
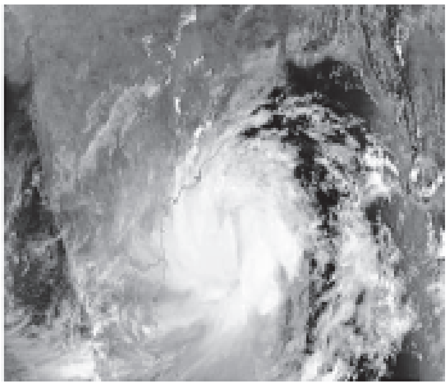
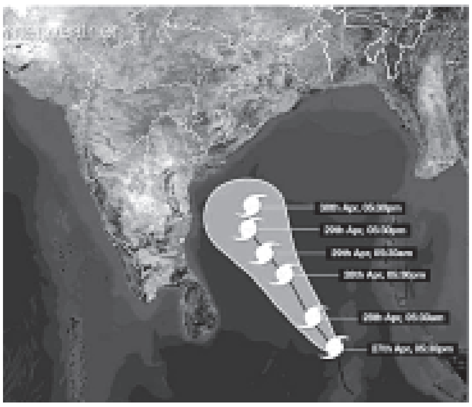
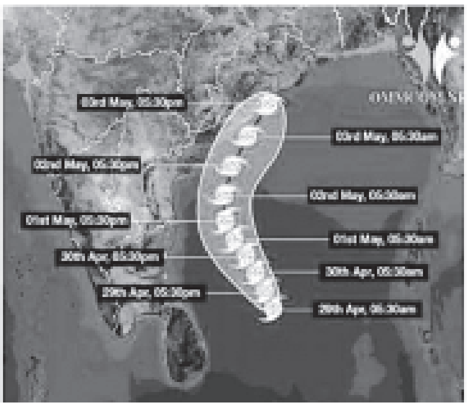
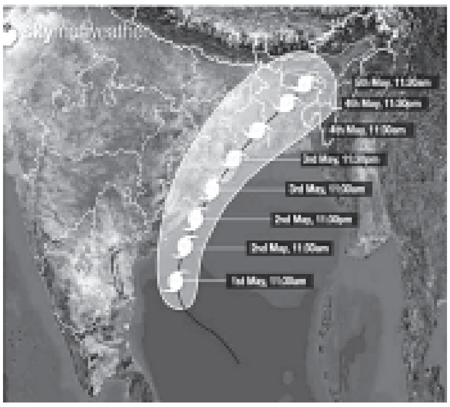

একটি নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে আরো কিছু অনুকূল পরিস্থিতির প্রয়োজন। যেমন বাতাসের উর্ধ্বমুখী গতিবেগের তারতম্য কম থাকা। সমুদ্র জলের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তাঁর বেশি থাকা। কমপক্ষে চার কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত জলীয়বাষ্পের স্থায়ী যোগান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বের হয়ে যাওয়া বিকিরণের মাত্রা কমতে থাকা। নিম্নচাপ কেন্দ্রের চারপাশে বজ্রমেঘ জমতে থাকা। করিওলির বল বা প্যারামিটার বেশি থাকা ইত্যাদি। এই বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে। তারপর দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তা উড়িষ্যার পুরী শহরের উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করে মে মাসের তিন তারিখ সকালে। পরে তা দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে বাংলাদেশের উপরে গিয়ে বিলীন হয় ৫ মে সকালে।

কোনও সাগর বা মহাসাগরের ঘূর্ণিঝড় ঠিক কোন পথে যাবে তা নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠ থেকে সাত কিলোমিটার ও তার উপরের স্তরের বাতাসের চাপ গতিবিধির উপর। ক্রান্তীয় সমুদ্র অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় কে চালিত করে বাতাসের উপরের স্তরের উপক্রান্তিয় উচ্চচাপ বলয় ও পশ্চিমী বাতাসের নিম্নচাপ অক্ষরেখা। আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় সাবট্রপিক্যাল রিজ ও টার্ফ ইন দি ওয়েস্টারলিস। উচ্চচাপ বলয়ে থাকে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। সাধারণ উচ্চচাপ বলয় বা বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত থাকে ঘূর্ণিঝড়ের উত্তরে বা উত্তর পূর্বে। উত্তর গোলার্ধে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত থেকে বাতাস ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয় তাই ঘূর্ণিঝড়ের গতি থাকে উত্তরপশ্চিমের দিকে। অনেক সময় সাবট্রপিক্যাল নিম্নচাপ অক্ষরেখা যথেষ্ট জোরাল হয় ফলে নিম্নচাপ অক্ষরেখার অগ্রবর্তী অঞ্চলে থাকা জোরাল দক্ষিণ পশ্চিমের বাতাস ঘূর্ণিঝড়কে উত্তরপূর্বের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তাই অনেক সময় বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ বা মায়ানমরের দিকে সরে যায়।

ক্রান্তিয় সমুদ্র অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় কতটা শক্তিশালী হবে বা ঠিক কোন দিকে যাবে তা নির্ভর করে আবহাওয়ামণ্ডলের ও সমুদ্র অঞ্চলের সেই সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর। এই জন্য ক্রান্তিয় সমুদ্র অঞ্চলের প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতি আলাদা আলাদা। গত দুই দশকে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। তৈরি হয়েছে বিভিন্ন গাণিতিক মডেল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাণিতিক মডেলগুলি আরও উন্নত হয়েছে। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে বঙ্গোপসাগরের অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফাইলিন ও হুদহুদের গতিবিধি তীব্রতা ও উপকূলে আঘাত করার সময় সম্পর্কে ভারত মৌসম বিজ্ঞান বিভাগের আবহাওয়াবিদরা সঠিক পূর্বাভাষ দিতে পেরেছেন। কিন্তু ১৯৯৯ সালের পারাদ্বীপে সুপার সাইক্লোন যে একই জায়গায় প্রায় ৪৮ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে তা অনুমান করতে পারেননি। যে কারণে প্রায় দশ হাজার মানুষ ও লক্ষাধিক গবাদি পশুর জীবনহানি হয়েছে।

এপ্রিল মাসের ২২ তারিখ নাগাদ একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের উপর সরে আসে দক্ষিণ চীন সাগর থেকে ও পশ্চিম দিকে সরতে থাকে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভারত মৌসম বিজ্ঞান বিভাগের আবহাওয়াবিদদের ধারণা হয় যে নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি প্রথমে ঘূর্ণাবর্ত ও পরে নিম্নচাপে

পরিণত হবে এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ। ২৭ তারিখ নিম্নচাপ আরো ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। সেই মর্মে তারা নোটিশ জারি করেন। আবহাওয়াবিদদের অনুমান সঠিক প্রমাণিত করে এপ্রিল মাসে ২৫ তারিখ নিরক্ষরেখার খুব কাছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়। সাধারণত নিরক্ষরেখার এত কাছে কোন নিম্নচাপ শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় না। কারণ পৃথিবীর আহ্নিকগতিজনিত বলের, আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে করিওলিস প্যারামিটার বা করিওলির বলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ফণী নিরক্ষরেখার খুব কাছেই তৈরি হয়েছে যেখানে করিওলির বল প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। তাই ঘূর্ণিঝড় ফণী অন্য সমস্ত ঘূর্ণিঝড়ের থেকে আলাদা।

২৬ এপ্রিল নিম্নচাপ কিছুটা উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে আসে ও গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। ২৭ এপ্রিল আরো কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে সরে এসে দুপুর নাগাদ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। গণ মাধ্যম ও বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থা অতি গভীর নিম্নচাপকেই ঘূর্ণিঝড় বলে চালাতে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকাতে নামটি ইংরাজিতে Fani লেখা থাকায় ঝড়ের নাম নিয়ে সংশয় তৈরি হয় ফেনি না কী ফণী। নামটি বাংলাদেশের দেওয়া। পরদিন অর্থাৎ ২৮ তারিখ সকালে অতি গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয় ঘূর্ণিঝড়ের নাম ফণী অর্থাৎ সর্প বা সাপ।

নামের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়টি আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে। সাপ যেমন কখন কোন দিকে বেঁকে যাবে তা আগে থেকে অনুমান করা যায় না তেমনি ঘূর্ণিঝড় ফণীর গতিবিধি নিয়েও যথেষ্ট সংশয় ছিল। তাই ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তায় কখনও তামিলনাড়ু কখনও অন্ধ্র উপকূল অতিক্রম করে বা কাছে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২৯ তারিখ রাতে ফণী প্রবল থেকে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উপর অবস্থান করছিল। ৩০ তারিখ সকালে ফনী আরো শক্তি সঞ্চয় করে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও পরে চরম তীব্রতার ঘূর্ণিঝড়ে (Extremely Severe Cyclonic Storm) পরিণত হয়েছে। উপগ্রহ ও রাডার চিত্রে তার আই বা চক্ষু সুস্পষ্ট রূপে দেখা গেছে। মে মাসের তিন তারিখ বিকেলের মধ্যে ফনী উড়িষ্যা উপকূলের পুরীর সামান্য দক্ষিণ দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে বলে আবহাওয়া দপ্তর তাদের পূর্বাভাষে জানিয়ে দেয়। ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১৮০ থেকে ২০০ কিলোমিটার। তারপর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উত্তর-পূর্ব দিকে সরে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলার উপর দিয়ে চলে যাবে বাংলাদেশের উপর চার তারিখ সন্ধ্যায়। ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ দ্রুত কমতে থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ৬০ কিলোমিটারের মধ্যে। আবহাওয়া দপ্তরের ১ মে তারিখের রাতের সতর্কবার্তায় বলা হয় ঘূর্ণিঝড় ফনী তিন তারিখ সকালে পুরী শহরের উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে। চার তারিখ সকালে চলে আসবে কলকাতার কাছে।

১৯৬৫ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর মিলিয়ে আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য ভাণ্ডারে ৪৬টি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য রয়েছে। তার মধ্যে ২৮টি বর্ষা পরবর্তী সময়ের ঘূর্ণিঝড়। বাকি ১৮টির মধ্যে ১৬টি তৈরি হয়েছে মে মাসে ও ১৯৬৬ ও ১৯৭৬ সালের দুটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ছিল এপ্রিল মাসে। এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর সর্বত্র ক্রান্তিয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ও ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে। ভারত মৌসম বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ কে জে রমেশ বলেছেন যে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সাগর মহাসাগরে জলের তাপমাত্রা বেড়েছে তাই ঘূর্ণিঝড়গুলি এত ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর সেই মতই পূর্বাভাষ ও সতর্কবার্তা জারি করে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য লাল সংকেত জারি করা হয়। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে না যেতে ও যারা গভীর সমুদ্রে আছেন তাদের উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টিপাত ও প্রবল ঝড়ো বাতাসের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। ঘূর্ণিঝড় ফণীর জন্য সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩০শে এপ্রিল দিল্লিতে আপদকালীন বৈঠক করেন ও তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা

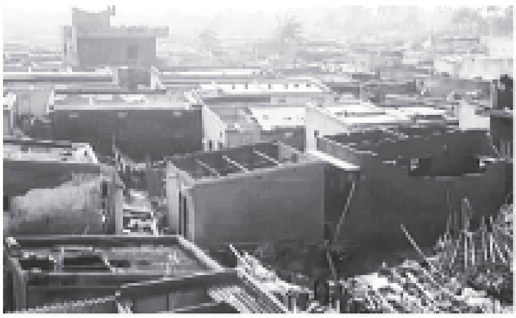

ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১০৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের পেকে যাওয়া বোরো ধান কেটে মাঠ থেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার, শাক সবজি ও পানের বরজের সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পূর্বাভাষ মতই চরম তীব্রতার ঘূর্ণিঝড় ফনীর কেন্দ্র মে মাসের তিন তারিখ সকাল আটটা থেকে দশটা, দু ঘণ্টা সময় ধরে পুরীর সমুদ্র উপকূল অতিক্রম করেছে। বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৮০ থেকে ১৯০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। তারপর প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় ধরে উড়িষ্যার উপকূলবর্তী জেলাগুলির উপর দিয়ে এগিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার দিকে। খুব দ্রুততার সঙ্গে ফণীর শক্তি কমেছে। চার তারিখ সকালে কলকাতার উপর চলে আসার পূর্বাভাষ থাকলেও ফণী কলকাতার ৫০ কিলোমিটার পশ্চিম দিয়ে এগিয়ে গেছে ও আরো উত্তর পূর্বের দিকে এগিয়ে চলে গেছে বাংলাদেশের উপর।

প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে থাকে তীব্র গতির বাতাস, প্রবল থেকে প্রবলতর পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। প্রবল বৃষ্টিপাত ও সমুদ্রের ঢেউ উপকূল ছাপিয়ে অনেকটা ভিতরে চলে আসায় উপকূল অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তীব্র হাওয়ার দাপটে কাঁচা ঘরবাড়ি, বিদ্যুৎ স্তম্ভ, টেলিফোন টাওয়ার, গাছের ডালপালা ভেঙে যায়। উপড়ে পড়ে বড়ো বড়ো গাছ। নির্মীয়মাণ পাকা বাড়িঘর ভেঙে পড়তে পারে। বাড়িঘরের টিন বা টালির চালা উড়ে যায় অনেকটা দূরে। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎবিহীন থাকে দিনের পর দিন। বিচ্ছিন্ন হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। বন্ধ হয়ে যায় রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা। বন্ধ রাখতে হয় বিমান পরিসেবা। ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত অঞ্চলে স্তব্ধ হয়ে যায় ব্যবসা বাণিজ্য। নেমে আসে মহা বিপর্যয়। ঘূর্ণিঝড় ফণীর দাপটে এই বিপর্যয় আমরা ঘটতে দেখেছি উড়িষ্যা রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। পুরী ও ভুবনেশ্বর শহর দুটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তাই ফণীর মতো প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য সবার প্রথমে প্রয়োজন সময় মতো সঠিক পূর্বাভাষ ও সতর্কীকরণ। আবহাওয়া দপ্তর অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে কাজটি করেছেন। তারপর সেই পূর্বাভাষ ও সতর্কবার্তা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। এখন আমাদের হাতে রয়েছে অত্যন্ত উন্নত মানের প্রযুক্তি, তাই পূর্বাভাষ ও সতর্কবার্তা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজটিও সঠিক ভাবেই হয়েছে। এর ফলে বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয়, জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সর্বস্তরে প্রশাসনিক সমন্বয় গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য সবার আগে যে দিকে নজর দেওয়া হয় তা হল এমন ব্যবস্থা করা যাতে প্রাণহানি না হয়। তাই উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে ১২ লক্ষ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ভারতের পূর্ব উপকূলের শহর পুরীর খ্যাতি হাজার বছরের প্রাচীন জগন্নাথদেবের মন্দির ও পর্যটন কেন্দ্র রূপে। ঘূর্ণিঝড় আসার ২৪ ঘণ্টা আগে পুরী শহর থেকে সমস্ত পর্যটককে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিজ নিজ স্থানে। বাদ যায়নি দক্ষিণবঙ্গের দিঘা ও অন্যান্য উপকূলবর্তী পর্যটন কেন্দ্রগুলিও। ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়। বন্ধ রাখা হয় দুশোরও বেশি রেল পরিসেবা। বিপর্যয় মোকাবিলায় এত তৎপরতার সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে উড়িষ্যায় ৬২টি অমূল্য প্রাণ বাঁচানো যায়নি। দক্ষিণবঙ্গে কোনও জীবনহানি নাহলেও বাংলাদেশে ১৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত অঞ্চলে খাদ্য ও পানীয় জলের সমস্যা প্রবল হতে থাকে। অনেক সময় জলবাহিত রোগ মহামারির আকার নিতে পারে।

সমস্ত রকমের জঞ্জাল সরিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা প্রশাসনের কাছে বড়োরকমের পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা ফণী প্রভাবিত অঞ্চলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্বহাল করার চেষ্টা করেছেন। খাদ্য ও পানীয় জল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন কাজ করে চলেছেন। ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের একটা বড় অংশ সমুদ্রতীরে ঝুপড়িতে বসবাস করেন। যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য তারা সবসময় প্রস্তুত থাকেন। ঝড়ে বিপর্যস্ত ঝুপড়ি তারা খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে জীবনকে নুতন ছন্দে চালিয়ে নিয়ে যান। উড়িষ্যায় ফণী প্রভাবিত অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া মানুষজন নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। ভেঙেপড়া ঘরবাড়ি সারাতে বা নতুন করে গড়তে সময় লাগবে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বড়ো রকমের ক্ষয় ক্ষতি না হলেও পুরির পর্যটন পুরনো ছন্দে ফিরতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। আশার কথা ফণী প্রভাবিত অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের রোগ বালাই তেমন ভাবে ছড়ায়নি। জমির ফসল ও অন্যান্য সব কিছু মিলিয়ে উড়িষ্যায় ফণী প্রভাবিত জেলাগুলিতে টাকার অঙ্কে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি। তুলনায় মেদিনীপুর জেলা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ১৮৬৪ সালের ৫ অক্টোবরের পর কোন ঘূর্ণিঝড় কলকাতায় আসার একটা আশা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ঘটেনি। সামান্য ঝোড়ো হাওয়া ও দিনভর হালকা বৃষ্টির উপর দিয়েই ফণীর প্রভাব মুক্ত হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। ২০০৯ সালের মে মাসের ঘূর্ণিঝড় আয়লার স্মৃতি নিয়েই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যদি কখনো ফণীর মতো কোনো ঝড় কলকাতায় আসে। বিজ্ঞানীদের ধারণা কালবৈশাখী ও বড়ো রকমের বৃষ্টিপাত ছাড়া অন্য কোনও রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতাকে পড়তে হয় না কলকাতার ভৌগলিক অবস্থানের জন্যই।

M. 9433802339, email : aknath54@rediffmail.com

সতী চক্রবর্তী

মানবজীবনে মাকড়সার ভূমিকা

হানাবাড়ি বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘর ভর্তি ধূলো ময়লা, পোকামাকড়, মাকড়সা আর মাকড়সার জালে ভর্তি ভুতুড়ে বিচিত্র চিত্র। এক ভয়ের পরিবেশ। মাকড়সা দেখলে যেমন বিরক্ত লাগে তেমন ভয়ও করে। কিন্তু মানুষের জীবনে মাকড়সার অন্য ধরনের ভূমিকা আছে। কে না জানে রবার্ট ব্রুস আর মাকড়সার গল্প, বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তী।

রবার্ট ব্রুস জন্মেছিলেন লকমাবের দুর্গে (Lochmaber Castle) ১২৭৪ সালে। তিনি যখন স্কটল্যান্ডের লর্ড ও নাইট ছিলেন ১৩০৬ সালে, ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে দেশান্তরী হন। একটি অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করেন তিনি। সেখানে নির্জন তিন মাস অতিবাহিত করেন। এই সময়ে একদিন তাঁর নজরে আসে একটি ছোট মাকড়সা জাল বোনার চেষ্টা করছে। প্রথমে জাল বোনার চেষ্টা করে সফল না হলেও বার বার চেষ্টা করার পর অবশেষে ব্রুস লক্ষ্য করলেন মাকড়সাটি গুহার দেওয়ালে সিল্কের মতো সুতো আটকে জাল বোনা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হল। মাকড়সার এই নিরন্তর প্রচেষ্টার সাফল্য, হতোদ্যম ব্রুশকে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রচলিত প্রবাদের বা উক্তিটির সৃষ্টি হয়। যদি প্রথম দিকে কৃতকার্যতা নাও আসে, তবে চেষ্টা, চেষ্টা, চেষ্টা, বার বার চেষ্টা করে যাও, (It is at first don't succed, try, try, try, try again) শেষপর্যন্ত সফল হবেই।

এরপর ব্রুস সৈন্য সংগ্রহ করে জয়লাভ করেন ঐতিহাসিক বান্নকবার্ণের যুদ্ধ (Battle of Bannockburn)। সেই ১৩১৪ সালে তিনি রাজার মুকুট ধারণ করেন ও সিংহাসনের দাবী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমশ স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা লাভের দাবীর সূত্রপাত ঘটান।

মাকড়সার ধৈর্য অধ্যাবসায় ছাড়াও অন্যান্য অনেক গুণ আছে। তার আগে মাকড়সার জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক। মাকড়সা এমনই দেখতে একটি প্রাণী যাকে দেখলেই কেমন ভয় করে। মাকড়সাভীতিকে অ্যারাকনোফোবিয়া বলে আর মাকড়সা বিশেষজ্ঞদের বলে অ্যারাকনোপজিস্ট। মাকড়সার বিবর্তন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কারণ এদের ফসিল বিশেষ পাওয়া যায়নি। মানুষের থেকেও বহু বছর আগে মাকড়সার উদ্ভব ঘটেছে বলে মনে করা হয়। মাকড়সাদের প্রায় ৩০ হাজার প্রজাতি আছে। এদের মধ্যে ২০ হাজার প্রজাতির বাস যুক্তরাষ্ট্রে। এদের আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের ভিন্নতা ছাড়া এরা নানা বর্ণের হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে নিজেদেরকে অভিযোজিত করতে পারে। ঘরে বাইরে, বনে, জলে, জঙ্গলে সর্বত্রই এদের বাস।

মাকড়সা অমেরুদণ্ডী সন্ধিপদী পর্বের প্রাণী, তবে এরা পতঙ্গ নয়। এরা একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষমাকড়সার আকৃতি ছোট আর স্ত্রীমাকড়সা আকৃতিতে বড় হয়। স্ত্রীমাকড়সা একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা মাকড়সা বের হয়। মা মাকড়সা আর তখন থাকে না। এরা মৌমাছি বা পিঁপড়েদের মতো সামাজিক প্রাণী নয়। এরা মাংসাশী। এদের মাথা ও বুক জুড়ে শিরোবক্ষ গঠন করে। মাথার সামনে থাকে আটটি যৌগিক চোখ। চোখের দৃষ্টি বেশ প্রখর। আর থাকে দু'জোড়া উপাঙ্গ। একজোড়া চেলিসেরা। মাথার নীচে দুপাশে ওপরের দিকে। চেলিসেরার দুপাশে থাকে পেডিপাল্প। শিরোবক্ষে থাকে চার জোড়া পা। শিরোবক্ষের নীচের অংশে থাকে উদর। মাকড়সার চেলিসেরার সঙ্গে যুক্ত থাকে একটা করে বিষগ্রন্থি। ঐ বিষে থাকে প্রোটিন বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচক। নিঃসৃত এই উৎসেচক শিকারের দেহকে নরম করে হজম সহজসাধ্য করে তোলে। মাকড়সাদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। (এক) জালবোনা মাকড়সা আর (দুই) জাল-না-বোনা মাকড়সা। জালবোনা মাকড়সাদের উদর গহ্বরে সুতো বোনার জন্য বেশ বড় সিল্ক গ্র্যান্ড বা গ্রন্থি থাকে। গ্রন্থি নিঃসৃত আঠালো রস উদরের পিছন দিকে অবস্থিত একাধিক সূক্ষ্ম সুতো কাটনি অঙ্গ বা স্পিনারেট (spinneret)। স্পিনারেটের সাহায্যে রস দিয়ে মাকড়সা সুতো তৈরি করে। ফাইব্রোইন প্রোটিন দিয়ে প্রস্তুত এই সুতো অত্যন্ত মজবুত ও স্থিতিস্থাপক।

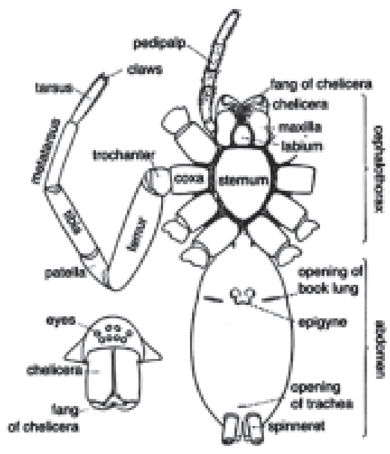

মাকড়সার অঙ্গের গঠন

মাকড়সার বিষ ও আকৃতি প্রসঙ্গে ট্যারানটুলা জাতীয় মাকড়সা উল্লেখ্য। তবে সব চাইতে বৃহদাকৃতির মাকড়সা চীনদেশে পাওয়া যায়। প্রায় একটা পাখীর মতো বড়। অধিকাংশ মাকড়সাই বিষাক্ত। ট্যারানটুলার শরীরে বীভৎস বিষাক্ত রস থাকে। স্পেনে ট্যারানটুলা ডান্স প্রচলিত ছিল। এই মাকড়সার কামড় খেয়ে লোকে হরদম নাচত। দক্ষিণ অ্যামেরিকার স্প্যানিস সংকর জাতির মধ্যে এই নেশার চলন আছে। বিষ তীব্র হলেও কম মাত্রায় ব্যবহারে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলে একটা প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। নিয়মিত ব্যবহারে এর ফল সাংঘাতিক হতে পারে।

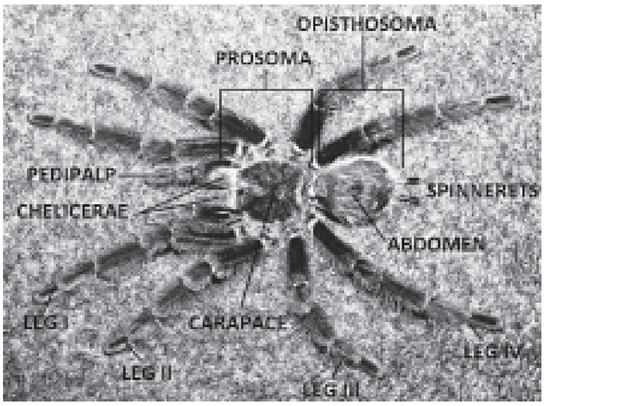

ট্যারানটুলা

ব্ল্যাকউইডো স্পাইডারও (*Lactro dectus*) ভয়ঙ্কর রকম বিষাক্ত। এর কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। পুরুষ ব্ল্যাকউইডো স্পাইডার তার সঙ্গিনীকে ভয় পায়। পুরুষটি তার বাসায় আসে কেবল মিলিত হওয়ার জন্য। পুরুষ মাকড়সাটির আকার স্ত্রী মাকড়সার চাইতে তিন বা তার চাইতে বেশি গুণ ছোট হয়। পুরুষ মাকড়সাটি স্ত্রী মাকড়সার খারাপ মেজাজের সময় বা খিদের সময় জালের মধ্যে যদি থেকে যায় তাহলে আর রক্ষা নেই। পুরুষমাকড়সাটি তখন তার খাদ্য হয়ে যাবে। ব্ল্যাকউইডো স্পাইডার নামটি তাই স্ত্রীমাকড়সার ক্ষেত্রে যথার্থ।

ব্ল্যাকউইডো স্পাইডার

বহু মানুষ মাকড়সার জাল থেকে সিল্ক তৈরির চেষ্টা করেছেন। বিশেষত ব্ল্যাকউইডো স্পাইডার থেকে। মাছ ধরার জাল, ব্যাগ, মাকড়সার জাল থেকে তৈরি করা হয়েছিল। এ সিল্ক অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু শক্ত। সোয়া এক ঘণ্টায় একটি মাকড়সায় ১৫০ গজ সুতো তৈরি করে। কিন্তু ৫০০০ হাজার মাকড়সার প্রয়োজন পড়ে একটি পোষাক তৈরি করতে। এর অর্ধেক রেশমগুটি থেকে একই সময়ে একই পরিমাণে রেশম পাওয়া যায়। রেশমকীটের গুটি থেকে পাওয়া সিল্ক মাকড়সার থেকে পাওয়া সিল্কের সুতোর মতো সূক্ষ্ম নয়। যেহেতু মাকড়সার সুতো অত্যন্ত সূক্ষ্ম তাই এই সুতো দিয়ে কাজ করা খুবই অসুবিধাজনক। তাছাড়া এদের একসঙ্গে রাখা বিষম ব্যাপার। এরা পরস্পরকে খেয়ে ফেলে। তাই রেশমকীটই সিল্ক সুতো তৈরির কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং নিরাপদও বটে।

মাকড়সার বিষের ভালমন্দের দিক ছাড়া পরিবেশে এর বন্ধুত্বের কথা বলতেই হয়। মাকড়সা মশা মাছি শিকার করে আমাদের উপকার করে। টুনটুনি, বুলবুলি পাখীরা মাকড়সাদের জালের সুতো জড়িয়ে জড়িয়ে বাসাগুলিকে মজবুত করে। বুলবুলি ছানাদের প্রোটিন খাদ্য তালিকায় থাকে মাকড়সা। কুমোর পোকাদের জীবনচক্রে মাটির বাসার মধ্যে থাকা লার্ভাদের একমাত্র খাদ্য মাকড়সাদের নিস্তেজ দেহগুলি। কৃষি জমিতে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে খাদ্য হিসেবে শিকার করে এরা আমাদের শস্যকে রক্ষা করে। ধানের মাজরা পোকাদের মেরে ফেলতে নেকড়ে মাকড়সার জুড়ি নেই। তবে কীটনাশকের প্রভাবে এই জৈব নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা বিপন্ন।

অতি সম্প্রতি মাকড়সা ও ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গে এক নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকা ও মালেয়শিয়ার মশা খেকো মাকড়সা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার এক যন্ত্র বিশেষ হয়ে উঠতে পারে। এ তথ্য জানিয়েছেন গবেষকগণ। পূর্ব আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদের আশেপাশে এক বিশেষ প্রজাতির মাকড়সা আছে যার নাম ইভারচা কালিসিভোরা (*Evarcha culicivora*)। স্ত্রী আনোফিলিস মশা যারা ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবী পরিবহন করে, তাদের ধরার জন্য এই মাকড়সা অভিযোজিত হয়েছে। এটি একটি অসামান্য ব্যাপার। এই মাকড়সা শিকারটিকে নিশানা করে সঙ্গে সঙ্গে উদরস্থ করে।

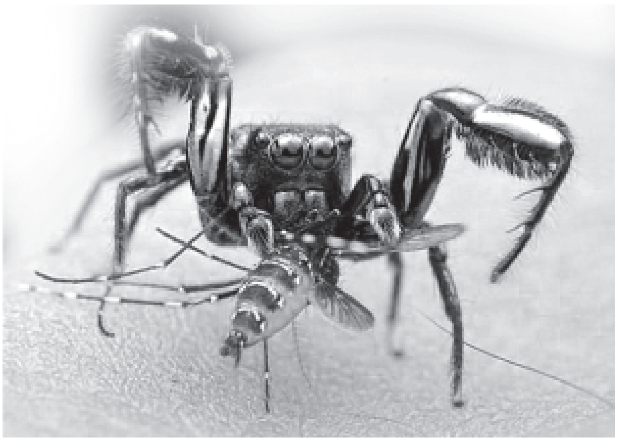

বিশিষ্ট মাকড়সাবিদ ফিওনা ক্রস (Fiona Cross) কেনিয়ায় অবস্থিত কীটপতঙ্গের শরীরবৃত্তীয় ও বাস্তু সংস্থান বিষয়ের কেন্দ্রে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি 'Study on Spider' বইটির সহলেখক। এই মাকড়সা মানুষের রক্ত খেতে ভালবাসে; কারণ এই রক্ত এদের শরীরে এক গন্ধের উৎপাদন ঘটায় যা মাকড়সাকে বিপরীত মাকড়সার প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে। মানুষের পক্ষে এই মাকড়সা ক্ষতিকারক নয়। গবেষকগণ বলেন, মানুষের দেহের রক্ত টেনে নেওয়ার মতো বিশেষ ধরনের কোন উপাঙ্গ এদের মুখে নেই। তাই চর্ম ভেদ করে মানুষের রক্ত টেনে নিতে অক্ষম। মানুষের রক্ত এদের পুষ্টিকর আহার্য। এই রক্ত পাওয়ার জন্য, স্ত্রী আনোফিলিস মশাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ্ অ্যারাকনোলজিতে। এই মশা রক্ত খাওয়ার পর বিশ্রামরত অবস্থায় উদরটি উঁচু ভঙ্গিমায় অবস্থায় করে। এই সময় মাকড়সা এদের সনাক্ত করতে সক্ষম হয় ও উদরস্থ করে।

ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে এই বিশেষ প্রজাতির মাকড়সার বিস্তার ঘটাতে পারলে, অ্যানোফিলিস স্ত্রীমশা তথা ম্যালেরিয়া আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

M. 9830744340

মহিলা বিজ্ঞানী : ৭

অনিন্দ্য দে

দেশজ ভেষজ নিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় অসীমা চট্টোপাধ্যায়

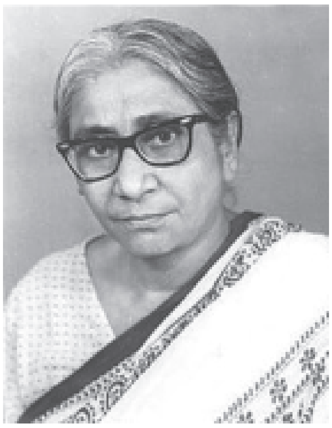

সময়টা স্বাধীনতারও আগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষণাগারে গভীর মনযোগে কাজ করে চলেছেন এক তরুণী। তবে গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি বলতে প্রায় কিছুই নেই। খুব সাধারণ বর্ণালী বিশ্লেষণের কাজটুকুও (যে সমস্ত কাজ আজকাল কলেজের ল্যাবরেটরিতেই করা যায়) করিয়ে আনতে হয় বিদেশ থেকে প্রচুর খরচ করে। প্রয়োজনের রাসায়নিক পদার্থগুলোও জোগার করতে হয় নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে। বৃত্তির পরিমাণ খুবই সামান্য। তাসত্ত্বেও গবেষণাপত্র ছাপানো, বিদেশি পরীক্ষকের কাছে ঐ গবেষণাপত্র পাঠানোর ডাকমাশুল, এসবও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার কাজে বিরাম নেই। তাকে যে অনেকটা দূর যেতে হবে। মারণ রোগের চিকিৎসায় ভারতীয় উপমহাদেশের গাছ-গাছালির গুরুত্ব যে কী অপরিসীম সেটা তাকে প্রমাণ করে দেখাতেই হবে। আর তাই এতখানি অধ্যাবসায়, এই অমানুষিক পরিশ্রম। ফল মিলেছিল অচিরেই। এখানকার ভেষজ উদ্ভিদ থেকে তৈরি করেছিলেন ম্যালেরিয়া, এপিলেপ্সির ওষুধ। বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল সাদরে বরণ করে নিয়েছিল আমাদের ঘরের মেয়ে অসীমাকে, অসীমা মুখোপাধ্যায়কে।

১৯১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অসীমার জন্ম এক নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে। মা কমলা দেবী সাধারণ গৃহবধূ। পেশা ডাক্তারি হলেও বাবা ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নেশা ছিল উদ্ভিদচর্চা। বাবার সেই নেশাই আজীবনকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অসীমাকে। ১৯৩৬ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে রসায়নে অনার্স নিয়ে স্নাতক হলেন মেধাবী অসীমা। ভর্তি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে। ১৯৩৮ সালে পেলেন জৈব রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। যোগ দিলেন গবেষণায়, অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার বসুর তত্ত্বাবধানে। গবেষণার বিষয় উদ্ভিদজাত পদার্থের রসায়ন ও সিন্থেটিক জৈব রসায়ন। শুরু হল এক কঠিন সংগ্রাম। তবে সে সময়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মতো মানুষজনদের কাছ থেকে। তাদের প্রেরণাতেই এগিয়ে চলল অসীমার নিরলস সাধনা। এর মাঝেই ১৯৪০ সালে অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করলেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। সেখানেই নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন রসায়ন বিভাগ। তিনিই সেখানকার বিভাগীয় প্রধান। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ সায়েন্স-এর (ডি. এসসি.) শিরোপা পেলেন অসীমা। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে এই প্রথম ডি. এসসি উপাধি দেওয়া হল কোনও মহিলা বিজ্ঞানীকে। সেই বছরেই সাম্মানিক (অনারারী) অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঠিক পরের বছরেই, ১৯৪৫ সালে আবদ্ধ হলেন পরিণয়সূত্রে। পাত্র ভৌত রসায়নবিদ অধ্যাপক বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অসীমা মুখোপাধ্যায়ের নতুন পরিচয় হল অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

১৯৪৭ সালে অসীমা ছুটলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। কাজ শুরু হল সেখানকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এল. এল. পার্কস-এর সঙ্গে। বিষয় প্রকৃতিতে উপস্থিত বিভিন্ন গ্লাইকোসাইড। জীবদেহে নানারকম কাজকর্মের অন্যতম প্রধান কারিগর এই গ্লাইকোসাইড। প্রাণিদেহে, বিশেষ করে মানুষের শরীরের বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থকে শরীর থেকে বাইরে বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন উদ্ভিদ নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থকে এই গ্লাইকো-সাইডের রূপেই সঞ্চয় করে রাখতে পারে। সেসমস্ত সঞ্চিত গ্লাইকোসাইড যে অনেক ক্ষেত্রেই নানা

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়

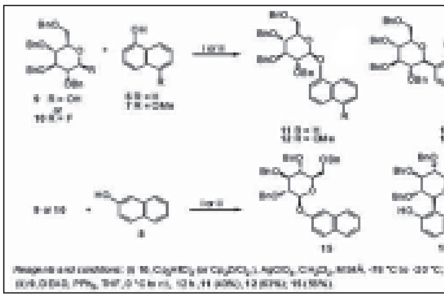

গ্লাইকোসাইড

রকমের ওষুধ তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান হতে পারে তারই সন্ধানে নামলেন অসীমা।

সেখান থেকে এলেন প্যাসাডেনার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। সেখানে কাজের ধারা কিন্তু একটু অন্যরকমের। গাজর, কলা বা ডিমের কুসুমের যে নিজস্ব একটা রঙ আমরা দেখি, তার মূলে যে রাসায়নিক পদার্থ তার নাম ক্যারোটিনয়েড। এটা একটা জৈব রঞ্জক। বিভিন্ন খাবার-দাবার থেকে যে ক্যারোটিনয়েড পাওয়া যায়, প্রাণিদেহে

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট

তারা জমা হয় বিভিন্ন ফ্যাটি টিসুতে। আবার আমাদের শরীরে বেশ কিছু পদার্থ আছে যারা ভিটামিনে রূপান্তরিত হতে পারে। এর মধ্যে বেশ কিছু পদার্থ আছে প্রাথমিকভাবে যাদের চরিত্র ভিটামিনের মতো না হলেও এরা ভিটামিনে পরিবর্তিত হতে পারে। এদেরকে বলা হয় প্রোভিটামিন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্যাসাডেনায় এল.

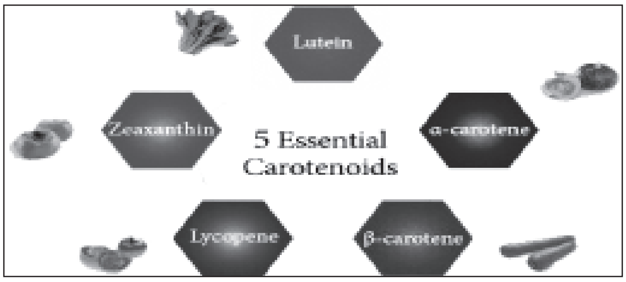

ক্যারোটিনয়েড

জেকমেইস্টারের সঙ্গে কাজ করলেন এই ক্যারোটিনয়েড এবং প্রোভিটামিন নিয়ে।

প্যাসাডেনার কাজ সেরে এবার অসীমা পাড়ি দিলেন ইউরোপের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে। নতুন গবেষণার বিষয় অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার।

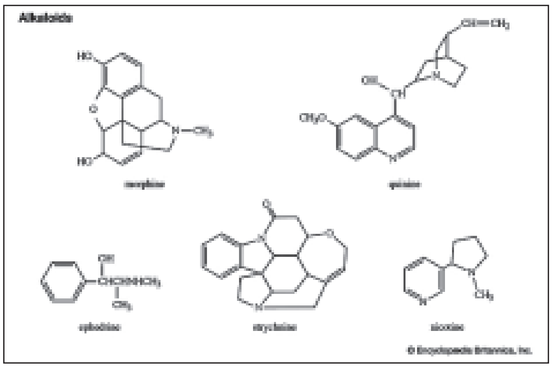

অ্যালকালয়েড

ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক থেকে শুরু করে উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহ— সব জায়গাতেই খোঁজ পাওয়া যায় এই উপক্ষারের। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে যে কুইনাইনকে আমরা চিনি তা একটা উপক্ষার। আমরা যে চা-কফি খাই তারাও উপক্ষার। আবার শ্বাসকষ্টের উপশমে, ব্যথা কমাতে, ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে, এমনকী ক্যান্সারের চিকিৎসাতে বিশেষ করে কেমোথেরাপিতে এই উপক্ষারের ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউরোপে এসে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল অসীমার সামনে। জুরিখের এন. এল. বিশ্ববিদ্যালয়ে পল ক্যারারের সঙ্গে অ্যালকালয়েড নিয়ে যে গবেষণা শুরু করলেন, পরবর্তী চল্লিশ বছর নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে গেলেন সেই পথ ধরেই।

১৯৫০ সালে ভারতে ফিরে এসে পুরোদমে গবেষণা শুরু করলেন ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে। সেসময়কার ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে দেশজ গাছ-গাছালিকে বেছে নেওয়ার মতো ভাবনা-চিন্তা করাটা মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছপালার যে ভেষজ গুণ আছে সে সম্পর্কে ভারতবর্ষের মানুষের ধারনা শতাব্দী-প্রাচীন। কিন্তু রোগ নিরাময়ের কাজটা তারা করে কীভাবে, সে ব্যাপারে কোনও ধারণাই তাদের ছিল না। অসীমার হাত ধরেই জানা গেল সেই মেকানিজম্। আজকাল যারা এই ধনের গবেষণায় যুক্ত, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স যন্ত্র বা বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্য ছাড়া তারা একটুও এগোতে পারেন না। কিন্তু ১৯৪০-৫০ সালে আমাদের এখানে সেসবের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। তাই ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় কী অসীম ধৈর্য্য আর কী অপরিসীম দক্ষতায় ভারতের মাটিতে বসে সেই সময়ে গবেষণা চালিয়ে গেলেন এই প্রতিভাময়ী নারী।

এই সময়ে অসীমার গবেষণার মূল বিষয় ছিল অ্যালকালয়েড। প্রাণিদেহে কোশ বিভাজনকে বন্ধ করে দিয়ে অবাঞ্ছিত কোশ বৃদ্ধিকে থামিয়ে দিতে পারে এমন এক জাতের অ্যালকালয়েড খুঁজে বের করলেন বাংলাদেশে অতি পরিচিতি সর্পগন্ধা, নয়নতারার মতো উদ্ভিদ

নয়নতারা

সর্পগন্ধা

থেকে। অসীমার গবেষণায় এর সঙ্গে যুক্ত হল কুমারিন। এই কুমারিন মিষ্টি গন্ধের একটা কেলাসাকার কঠিন পদার্থ। এর কোনও রঙ নেই। সুগন্ধি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় এই কুমারিন, বেশ কিছু উদ্ভিদ রাসায়নিকভাবে প্রতিরক্ষার জন্যও একে ব্যবহার করে। বাংলাদেশের অতি পরিচিত বেলগাছে খুঁজে পেলেন এক বিশেষ জাতের কুমারিন। পাকস্থলী ও অন্ত্রের অসুখের ওষুধ তৈরি করলেন এই বেল থেকেই। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের এক জটিল অসুখ এপিলেপ্সি। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে শুশুনি শাক আর জটামাংসীর মধ্যে এপিলেপ্সি নিরাময়ের উপকরণ খুঁজে পেলেন অসীমা। তৈরি হল ওষুধ আয়ুষ-৫৬। ছাতিম, চিরতা, লতাকরঞ্জের মতো উদ্ভিদ থেকে তৈরি করলেন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক আয়ুষ-৬৪। দেশ-বিদেশের নামী-দামী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর চারশোরও বেশি গবেষণাপত্র।

১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৬২ সালে তাকে বেছে নেওয়া হল সম্মানজনক খয়রা অধ্যাপক হিসেবে। টানা কুড়ি বছর অসীমাই ছিলেন এই খয়রা অধ্যাপক হিসেবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রাকৃতিক উপাদানের রসায়ন বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে চালু হয় স্পেশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম। এর সাম্মানিক পরিচালক (কো-অর্ডিনেটর) হিসেবে নিযুক্ত করা হয় অসীমাকে। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ অন ন্যাচারাল প্রোডাক্টস।

তাঁর আজীবনের স্বপ্ন ছিল আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তৈরির জন্য ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার জন্য একটা আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করার। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল তৈরি

করা যাতে গবেষণার ফলাফল সরাসরি যাচাই করে নেওয়া যায়। তাঁর অদম্য ইচ্ছায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াসে কলকাতার সল্টলেকে সেই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের সাম্মানিক অধিকর্তা ও পরিচালক।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখেছিলেন 'সরল মাধ্যমিক রসায়ন' নামের পাঠ্যপুস্তক। ড. কে. পি. বিশ্বাস ভারতের ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে ছয় খণ্ডের এক ম্যাগনাম ওপাস লিখেছিলেন 'ভারতীয় বনৌষধি' নামে। অসীমা বইটির সম্পাদনা করে সমগ্র বইটিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেন 'The Treatise of Indian Medicinal Plants' নাম দিয়ে।

জীবনে পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন অনেক। ১৯৬০ সালে নির্বাচিত হন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো হিসেবে। পরের বছর, ১৯৬১ সালে পান শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার। ১৯৭৫ সালে ভারত সরকারের তরফ থেকে পদ্মভূষণ সম্মানে বিভূষিত করা হয় তাঁকে। ওই বছরেই ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের বাষট্টিতম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন অসীমা। এই প্রথম একজন মহিলা বিজ্ঞানীকে সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে। ১৯৮২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সুপারিশে রাজ্যসভার সদস্যও মনোনীত হন অসীমা; ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আসীন ছিলেন ওই পদে। ২০১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, অসীমার জন্মশতবর্ষে গুগ্‌ল-এর সার্চ এঞ্জিনে আমরা দেখতে পেয়েছি তাকে শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি করা একটি বিশেষ ডুড্‌ল।

ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের গুণমুগ্ধ অসীমা কণ্ঠসঙ্গীতের প্রথাগত তালিমও নিয়েছিলেন অতি নিষ্ঠাভরে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রকৃতির পাঠশালায় মনোযোগী ছাত্রের মতো অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়ার এক অদম্য বাসনা ছিল তার। নিজের জীবনদর্শনে এবং কর্মসংস্কৃতিতে সেকথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন আজীবন। ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বর আমরা তাকে হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু অদম্য ইচ্ছা আর দেশজ সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান সাধনার যে রাস্তা তিনি দেখিয়ে গেছেন, সে প্রেরণা কোনোদিনই হারিয়ে যাওয়ার নয়।

M. 9432220412, email : anindya05@gamil.com

সুজিত কুমার নাহা

'হর্স পাওয়ার' কীভাবে হল ক্ষমতা পরিমাপের মাপকাঠি

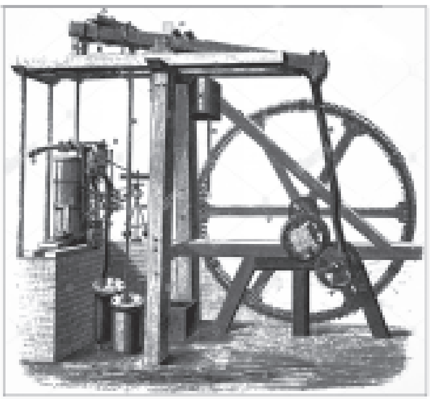

জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন

ঘোড়ার গাড়ী

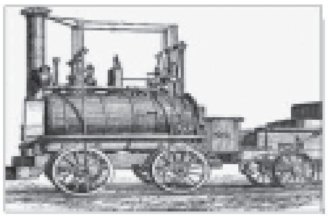

বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত গাড়ী

ক্ষমতা (power) পরিমাপের একক হিসেবে 'হর্স পাওয়ার' কথাটার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। ক্ষমতা মাপার ব্যাপারে এত প্রাণীর মধ্যে ঘোড়াকেই কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। ধন্দ দূর করতে হলে প্রযুক্তির ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে এবং এটা করলে যে তথ্য উঠে আসবে তা শুধু যে কৌতূহলপ্রদ তাই নয়, রীতিমতো আশ্চর্যজনকও!

আসলে, ইঞ্জিনের ক্ষমতা মাপার দায়িত্ব ঘোড়া পেয়েছিল স্রেফ বিক্রিবাটার খাতিরে! বিপণনের চাপ না থাকলে ক্ষমতার মাপকাঠি হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসত অন্য কোনো একক। ঘোড়ার সাথে ক্ষমতা মাপার একক কিভাবে জড়িয়ে পড়ল যে আশ্চর্য কাহিনি এবার সংক্ষেপে তা বলা যাক।

সময়ের স্রোত উজিয়ে পেছিয়ে যেতে হবে প্রায় আড়াইশো বছর। স্কট প্রযুক্তিবিদ জেমস ওয়াট (1736-1819) ও ইংরেজ যন্ত্রপাত নির্মাতা ম্যাথু বোলটন (1728-1809) যুগ্মভাগে 1775 খ্রিস্টাব্দে একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন (Steam Engine) তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন ক্ষমতার বাষ্পীয় ইঞ্জিন উৎপাদিতও হচ্ছে। কিন্তু বিক্রিবাটা নিতান্তই কম।

প্রশ্ন উঠবে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মতো একটি দরকারি জিনিসের বেচাকেনা কেন কম। আসলে গোল বাধছে একটা ব্যাপারে। ক্ষমতা মাপার কোনও মাপকাঠি তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। কোন কাজ সম্পাদন করতে কত ক্ষমতা দরকার সেই সময়ে সেটা প্রকাশ করা হত ঘোড়ার সংখ্যা দিয়ে। ইঞ্জিন বেচতে গিয়ে ওয়াট পড়তেন মহা সমস্যায়। ক্রেতারা জানতে চাইত ক'টা ঘোড়ার কাজ করতে পারবে ইঞ্জিনটি। উত্তর জানা না থাকায় ওয়াট চুপ করে থাকতেন। বেশির ভাগ ক্রেতাই ফিরে যেত ইঞ্জিন না কিনেই। অজ্ঞাত ক্ষমতার ইঞ্জিনের থেকে জানা ক্ষমতার ঘোড়া যে অনেক বেশি ভরসার!

চৌকস ওয়াট বুঝতে পারলেন, জমিয়ে ব্যবসা করতে হলে বিভিন্ন মডেলের ইঞ্জিনগুলি কত ঘোড়ার সমতুল ক্ষমতাসম্পন্ন সেটা নির্ণয় করতেই হবে। প্রযুক্তিবিদ ওয়াট জানতেন, কাজ করার হারই হচ্ছে ক্ষমতা। কাজেই একটা ঘোড়া কী হারে কাজ করতে পারে সেটা মেপে ফেলতে পারলেই ঘোড়ার ক্ষমতা কত তা জানা সম্ভব হবে। অতঃপর একটা ঘোড়া যোগাড় করে ঠিক এই কাজটাই করে ফেললেন ওয়াট। আর এভাবেই ক্ষমতার একক 'হর্স পাওয়ার'-এর প্রচলন হল।

জেমস ওয়াটের অবদানের স্বীকৃতিতে ক্ষমতার আন্তর্জাতিক এককের নাম দেওয়া হয়েছে 'ওয়াট'। এক 'হর্স পাওয়ার' প্রায় সাড়ে সাতশো ওয়াটের সমান।

M. 9830367036, email : sk.naha@gmail.com

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

খাদ্যের মাধ্যমে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমান

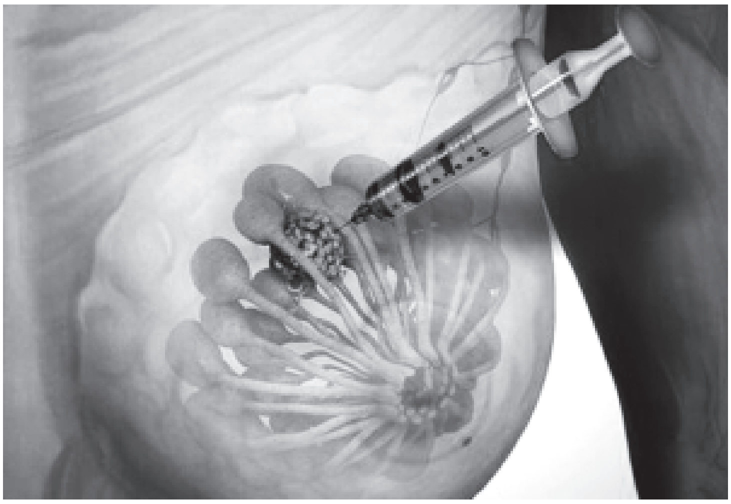

ভারতে এখন স্তন ক্যানসারের প্রকোপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মূল কারণ : আমরা অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের জীবনশৈলিকে অনুকরণ করে চলেছি চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রাকে ত্যাগ করে। স্তন সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা, শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি অযথা অতিরিক্ত যত্নবান হওয়া, কৃত্রিমভাবে স্তনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ দেওয়া, প্রতিদিনের খাদ্য নির্বাচনে সুষম খাদ্যের বদলে ফাস্টফুডকে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি এদেশের মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যানসার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে চলেছে। সত্যি বলতে কি স্তন ক্যানসার থেকে মুক্তি পেতে আজ যেখানে পাশ্চাত্যের মানুষ সরল জীবনযাত্রায় ফিরে যাচ্ছেন, সেখানে আমরা জেনেশুনেও উদ্দাম লাগামছাড়া জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ফলে বাড়ছে স্তন ক্যানসারের ঝুকি।

স্তন ক্যানসার পুরুষদেরও হয়, আর যেহেতু তা শতাংশের প্রশ্নে অত্যন্ত কম, তাই এই আলোচনায় স্তন ক্যানসার বলতে আমরা বুঝবো মহিলাদের স্তন ক্যানসার। এই মুহূর্তে বিশ্বে প্রতি বছর স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রায় ১৭ লক্ষ মহিলা। আর ভারতে মোট প্রায় দেড় লক্ষ প্রতি বছরে।

তাই আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আসুন, স্তন ক্যানসার থেকে উদ্ধার পেতে এর ঝুঁকিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলবো, এই প্রতিজ্ঞা করি। আমরা জেনে নিই, কোন কোন খাদ্য খেলে এবং কোন কোন খাদ্যকে এড়িয়ে চললে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিগুলিকে দূর করা যায়।

একেবারে কমিয়ে ফেলুন চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণ। এই চর্বি হল রেড-মিট থেকে জাত চর্বি, তাই মাংস খাওয়া কমান। উল্টোদিকে বাড়িয়ে দিন মাছের তেল বা চর্বি খাওয়া, যেখানে আছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, যা স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাবে। বেশি করে আঁশ বা ছিবড়ে যুক্ত শাকসব্জী খাওয়া অভ্যেস করুন। এইগুলি পাওয়া যায় শাকসব্জীর ছালে এবং ভিতরে, আটার ভুসিতে, প্রায় সমস্ত রকমের ফলেতেই, যেমন আলু, পটল, ঝিঙে, কড়াইশুঁটি, ঢ্যাঁড়শ, সিম, বরবটি, কলা, শাঁকালু, রাঙালু, আম, আনারস, কাঁঠাল, বেদানা ইত্যাদিতে ছিবড়ে পাওয়া যায়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত খাদ্য স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। তাই ভিটামিন-সি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ই যুক্ত খাবার খেতেই হবে অর্থাৎ সমস্ত রকমের লেবু, পেয়ারা, আমলকি, শশা, বেরি জাতীয় ফল, আঙ্গুর, দুধ, ডিম, শষ্যদানা, পালংশাক, নটেশাক, বিট, গাজর, ন্যাসপাতি, আপেল ইত্যাদি খেতে হবে, খেতে হবে সোয়াবিন, যেখানে আছে স্তন ক্যানসার প্রতিরোধী ফাইটোইস্ট্রোজেন। আবার ইনডোল ৩-কার্বিনল নামে এক উদ্ভিজ পদার্থ মহিলাদের রক্তে অতিরিক্ত ইস্ট্রোজেনকে নিষ্ক্রিয় করে স্তন ক্যানসার থেকে রক্ষা করে। এই পদার্থটি পাওয়া যায় ফুলকপি, সবুজ ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদিতে। স্তন ক্যানসার থেকে মুক্তি পেতে সবুজ চা পান করুন কিন্তু একেবারে কমিয়ে ফেলুন মদ্যপান।

টোম্যাটোতে থাকে লাইকোপিন, গাজর-কুমড়োয় থাকে ক্যারোটিন, হলুদে থাকে কারকিউমিন, এগুলি স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

এই প্রসঙ্গে বলবো, যতটা পারেন শরীরচর্চা করুন। আর গুরুত্বপূর্ণ হল, মায়েরা তাঁদের সন্তানদের যতদিন পারেন মাতৃদুগ্ধ পান করান, তাতে মায়েদের যেমন স্তন ক্যানসারের ঝুকি কমবে, তেমনি সেইসব সন্তানদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও বাড়বে।

M. 9433309056, email : sankarku_nath@yahoo.co.in

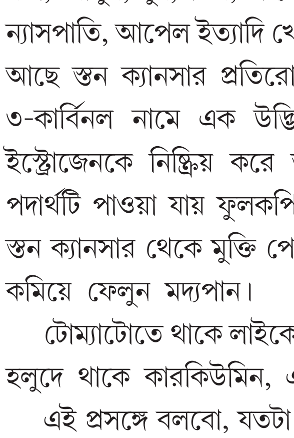

আমার ক্যানসার ভীতি আমর জীবনকে পরিবর্তিত করেছে। এখন প্রত্যেকটা নতুন সুস্থ দিনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ক্যানসার আমার জীবনকে, অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করেছে।

—ওলিভিয়া নিউটন-জন

ম নো তো ষ মি ত্র

‘জানা যখন ‘অজানার’ গভীরে

সেদিন হঠাৎই পাপান ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা করলো—‘স্যার—।’ ওকে থামিয়ে বললাম—‘আগে বোসো। ঠান্ডা হও। তারপর তোমার প্রশ্ন গুছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর।’ পাপান লজ্জা পেল। এরপর গ্লাসে মুখ লাগিয়ে ঢক ঢক করে কিছুটা জল খেয়ে গুছিয়ে বসল। মুখ রুমালে মুছে জিজ্ঞাসা করল—‘স্যার, আমরা এখন কিছু জিনিস এমনভাবে শিখি যা মুখস্থ করার মতো। কিন্তু সঠিক অর্থে উপলব্ধি হয় না।’ বললাম—‘কি এমন শিক্ষা, যা তুমি বুঝতে পারছো না।’ পাপান বলল—‘সেদিন সন্ধ্যায় আপনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি সেদিন উত্তর খুঁজে না পেয়ে পালিয়েছিলাম। ভাবলাম জীবন থেকে পালিয়ে গেলেই তো হেরে যাওয়া। তাই ফিরে এলাম। আজ উত্তরটা না শুনে যাব না।’ বললাম—‘ঘটনাটা অন্তত বল। তারপর উত্তরটা বলা যাবে।’ পাপান বলল—‘সেদিন আপনি বলেছিলেন, তিন লিটার দুধ পাঁচজনের ভিতর ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কতটুকু পাবে? উত্তরে বলেছিলাম—তিনের পাঁচ লিটার বা প্রত্যেকে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ ($^3/_5$ লি.) পাবে। আপনি বললেন—ঠিক বলেছো। কিন্তু তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—প্রমাণ করতে পারবে সবাই সমান $^3/_5$ লি. করেই পেয়েছে? উত্তরটা তো ভাগ প্রক্রিয়ার একটা বাধা গত মেনেই বলে যাও। কিন্তু পিছনের ক্রিয়াশীল রহস্যের চাবিকাঠিটা কি জান?’ উত্তর খুঁজে না পেয়ে সেদিন পালিয়েছিলাম। তাই আজ উত্তরটা জানবার জন্য এলাম। বলবেন স্যার?’ বললাম—‘পা তুলে ভাল করে বোসো।’ পাপান পা তুলে গুছিয়ে বসল। বললাম—‘দাঁড়াও একটা স্কেল আনি। প্রথমেই একটা ছবি আঁকবো। ছবি আঁকলেই তোমার উত্তর তুমি পেয়ে যাবে।’ বলে একটা স্কেল এনে নিচের এই ছবিটা এঁকে ফেললাম ওর সামনে।

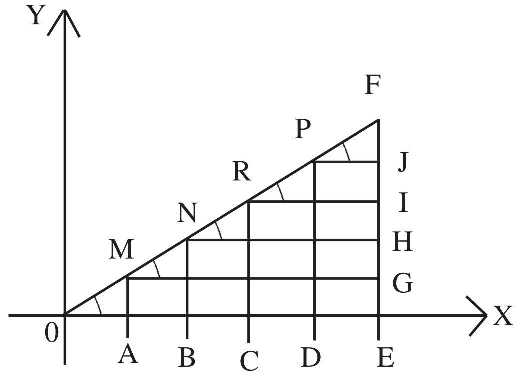

ছবি আঁকার ফাঁকে পাপানের সাথে বলছিলাম কিছু কথা। যা আমাকেও নাড়িয়ে যায়। বললাম—জানো পাপান বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় গণিতের শিক্ষা বড় বেশি মুখস্থ নির্ভর ও গতানুগতিকতার অসুখে আক্রান্ত। একেবারে অন্ধ অনুকরণ করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। আলতো ছোড়া কিছু সূত্র বা গাণিতিক তথ্য ছাত্র শিক্ষক নির্বিশেষে গলাধঃকরণ করে মস্তিষ্কে ধারণ করে চলেছে। প্রয়োজন মতো তা ব্যবহার করে প্রশ্ন ও উত্তরের সাযুজ্যতায় গাণিতিক সাফল্যের দাবী করে। ফলে বিশেষ প্রক্রিয়ার সমাধানের বিশেষ কৌশলটির প্রতি আগ্রহ এবং ফলস্বরূপ এক প্রকার মুখস্থ প্রকাশ হয়ে উঠে গণিতের জাতীয় সঞ্চয়। গাণিতিক সমস্যার গভীরে ঘটে চলা অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, জ্যামিতিক দৃশ্য-গ্রাহ্য কারণ নির্দেশক ব্যাখ্যা ইত্যাদির রহস্যের পর্দা উন্মোচিত না হওয়ার ফলে গাণিতিক অঙ্কন আজ অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা নামক এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। কথা বলতে বলতে আঁকাও শেষ। এরপর বললাম—দেখো পাপান গণিত হল বিমূর্ত বিষয়। বিষয়টিকে চিত্রের সাহায্যে মূর্ত করে তুলতে পারলে অর্থাৎ দৃশ্যগ্রাহ্য করে তুলতে পারলেই বিষয় অনেক সহজ হয়ে আসে। এই ছবিতে OX ও OY হল দুইটি অক্ষ। যেহেতু সমস্যাটি 3 লিটার দুধ 5 জনের ভিতর ভাগ করতে হবে, তাই 5 জনকে যথাক্রমে A,B,C,D,E নামকরণ করে X-অক্ষের উপর নির্দিষ্ট অবস্থানে নির্দিষ্ট একক দূরত্বে চিহ্নিত করা হল। A,B,C,D,E বিন্দুর অবস্থান হল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম জনের অবস্থান। শেষতম তথা পঞ্চম জন E এর অবস্থানে 3 লিটার দুধকে Y-অক্ষ বরাবর EF অংশ নেওয়া হল। OF যুক্ত করা হল। এই OF রেখাই হল প্রাপ্তিসূচক রেখা। এখন A,B,C,D,E পাঁচজনের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে X অক্ষর উপর লম্ব অঙ্কন করলে লম্বগুলি OF রেখাকে যথাক্রমে M,N,R,P,F বিন্দুতে ছেদ করে। আবার M,N,R,P বিন্দু থেকে EF রেখার উপর অঙ্কিত অভিলম্বগুলি EF রেখাকে যথাক্রমে G,H,I,J বিন্দুদে ছেদ করে। যেহেতু OF হল প্রাপ্তিসূচক রেখা। এখন A বিন্দুতে অবস্থিত প্রথম জনের প্রাপ্তিসূচক রেখার প্রকাশ হল $\angle MOA$। B বিন্দুতে অবস্থিত দ্বিতীয় জনের প্রাপ্তিসূচক রেখার প্রবণতা $\angle NOB$। ঠিক একইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম জনের প্রাপ্তিসূচক রেখার প্রবণতা যথাক্রমে $\angle ROC$; $\angle POD$ এবং $\angle FOE$

$\because \angle MOA = \angle NOB = \angle ROC = \angle POD = \angle FOE$. কারণ C||MG||NA||RI||PJ; OF ছেদক।

ফলে কোনগুলি অনুরূপ কোণ হওয়ার সমান।

A অবস্থানে প্রথম জনের প্রাপ্তির পরিমাণ হল GE অংশ = 3/5 লি.

B	”	দ্বিতীয়	”	”	” GH ”	= 3/5 লি.
C	”	তৃতীয়	”	”	” HI ”	= 3/5 লি.
D	”	চতুর্থ	”	”	” IJ ”	= 3/5 লি.
E	”	পঞ্চম	”	”	” JF ”	= 3/5 লি.

পাপান এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। হঠাৎই বলে উঠল স্যার স্কেলে একক ঠিক থাকলে EG = GH= HI = IJ = JF দেখানো যাবে? বললাম—‘একটা স্কেল এনে মেপেই দেখো না।’ পাপানের মুখ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বলল—‘স্যার অঙ্কের প্রতিটি শাখায় প্রতিটি সমস্যার গভীরে যে নিঃশব্দ অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক খেলা করে তা যদি এইরকম দৃশ্যগ্রাহ্য করে তুলে ধরা হয় তবে গণিত শিক্ষা অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। বললাম—‘তা তো বটেই।’

M. 9734695094

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্তী

হদিস মিলল ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম রাসায়নিক বিক্রিয়ার

বিষয় হিসাবে রসায়ন কিন্তু অনেকটাই নতুন। অন্তত পদার্থবিদ্যা ও গণিত সমৃদ্ধ বিজ্ঞান জগতের নিরিখে। বিদগ্ধজনেরা ল্যাভ্যসিয়েরকে আধুনিক রসায়নের জনক হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। এই বিজ্ঞানীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবীদের হাতে, গিলোটিন যন্ত্রে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিককার ঘটনা। ব্রহ্মাণ্ডের সময়কালের নিরিখেও কিন্তু রসায়নের সূত্রপাত পদার্থবিদ্যার পরে। ভাবতে অদ্ভুত শোনালেও এটাই কিন্তু সত্যি। কয়েক দশক আগে First Three Minutes নামে একটি বই লিখেছিলেন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েনবার্গ। মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং-এর মুহূর্তক্ষণ থেকে পরবর্তী কয়েক মিনিট সময় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের নিরিখে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এই সময়েই জন্ম নিয়েছে প্রয়োজনীয় এলিমেন্ট্রি পারটিক্যালস, যা থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়। তবে প্রথম মৌল হিসাবে এই জগতে যা আবির্ভাব ঘটে সে হল হাইড্রোজেন। একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত হাইড্রোজেনের এই আইসোটোপটির প্রাচুর্য (মৌল হিসাবে) গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বাধিক। বিপুল তাপ ও চাপের উপস্থিতিতে এই হাইড্রোজেন পরমাণুরাই নিজেদের মধ্যে পিষে গিয়ে তৈরি করে হিলিয়াম, যে প্রক্রিয়া নিউক্লিয়ার ফিউশন নামে পরিচিত। নক্ষত্রের গর্ভে চলতে থাকে এই প্রক্রিয়া, যার ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তি ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। আসলে এই হাইড্রোজেন ফিউশনই প্রত্যেকটি নক্ষত্রের শক্তির উৎস। তবে একাধিক পরমাণু মিলে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি এবং এর ফলে অণুর জন্ম কিন্তু এইরকম প্রচণ্ড তাপ ও চাপ সমৃদ্ধ পরিবেশে সম্ভব নয়। তাই বিষয় হিসাবে রসায়নের কোনো ধারণাও সেখানে প্রযোজ্য নয়।

বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েনবার্গ

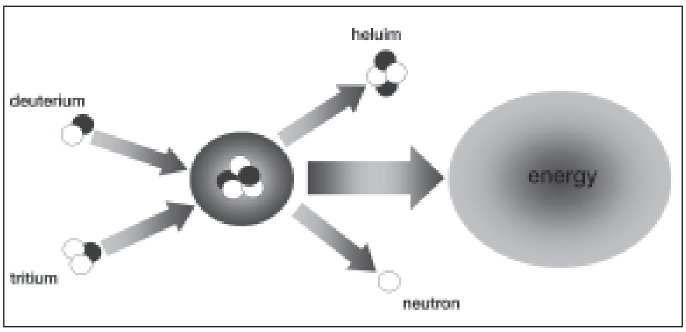

হাইড্রোজেন ফিউশন

তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঠিক কোনটি এবং কখন হয়েছিল সেই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তর মতবিরোধ চলছিল দীর্ঘদিন থেকেই। বিজ্ঞানীদের হিসাবে অনুযায়ী প্রায় ১৩.৮ লক্ষকোটি বছর আগে বিগ ব্যাং পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল হিলিয়াম হাইড্রাইড আয়ন (HeH^+)। ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম দুই মৌল অংশগ্রহণ করেছিল প্রথম রাসায়নিক বন্ধন তৈরিতেও। আর তৈরি হয়েই হারিয়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে। HeH^+ আয়নের অস্তিত্ব যে সত্যি আছে তা প্রমাণিত হয়েছিল সেই ১৯২৫ সালেই। তবে মহাশূন্যে এর অস্তিত্ব কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না গবেষকরা। সেটাই এবার ক'রে দেখালেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের একদল বিজ্ঞানী। রল্‌ফ গুয়েস্তেন এবং তাঁর সহকর্মীরা এই কাজে ব্যবহার করেছেন উন্নতমানের টেট্রাহার্জ স্পেক্ট্রোমিটার। দূরের নেবুলা থেকে আসা তড়িত-চুম্বকিয় তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে তাঁরা সেখানে HeH^+ আয়নের ঘূর্ণন জনিত শক্তির ভূমিস্তরীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (১৪৯.১৩৭ μm) শনাক্ত করেন।

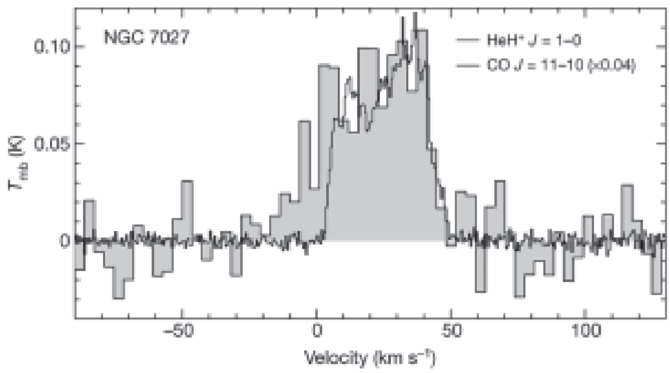

পৃথিবীকে ঘিরে রাখা ওজোনস্তর এবং জলীয়বাষ্প এই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ-এর শক্তিকে ভূপৃষ্ঠে আসতে বাঁধা দেয়। তাই গবেষকরা সাহায্য নিয়েছিলেন Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (Sofia)-র। এই সাফল্যে খুব খুশী আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পদার্থের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণা তাহলে ঠিক পথেই এগোচ্ছে!

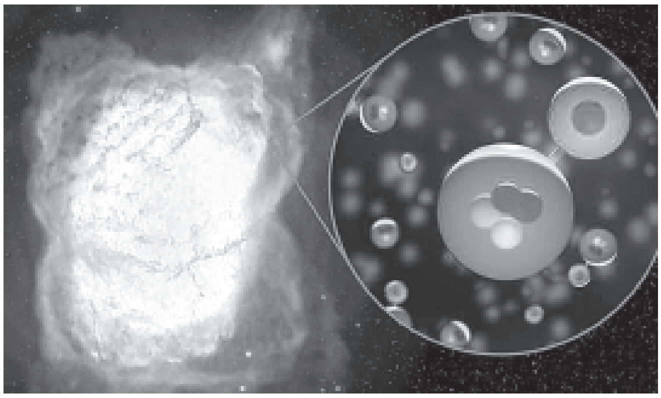

হিলিয়াম হাইড্রাইড প্রথম অণু

M. 9434377067, email : acnbu13@gmail.com

রতন দেবনাথ

চাঁদ কি ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে?

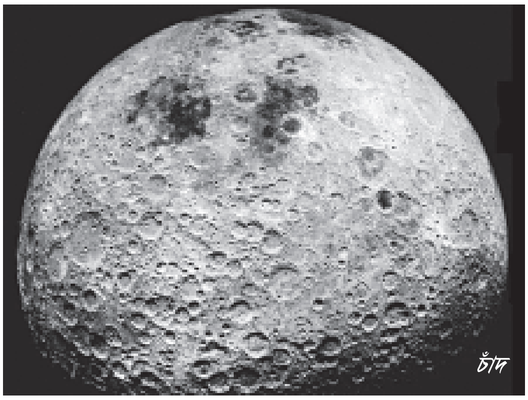

চাঁদ

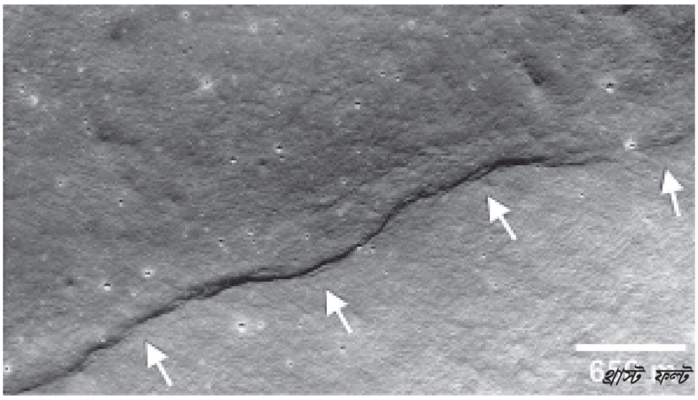

থ্রাস্ট ফল্ট

আমাদের চাঁদ কি ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে? সম্প্রতি 'নেচার জিওসায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এরকমই এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেখানে বলা হচ্ছে, ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে চাঁদ। বিগত কয়েক মিলিয়ন বছরে ঠান্ডা হতে হতে চাঁদের আকার কমে গিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ মিটারের মতো। আর সেই সঙ্গে ঘটে চলেছে চন্দ্র-কম্পণ, ঠিক পৃথিবীতে যেমন হয় ভূমিকম্প।

ক্রমাগত ছোট হতে থাকা চাঁদের গায়ে সৃষ্টি হচ্ছে সিঁড়ির মতন খাঁজ। ব্যাপারটা ঠিক আঙুর থেকে কিসমিস হওয়ার মতো। কিসমিসে পরিণত হলে আঙুরের আকার ছোট হয়, চামড়া কুঁচকে যায়। সেরকম চাঁদের আকার ছোট হতে থাকলে চাঁদের গায়েও ভাঁজ পড়তে থাকে। তবে আঙুরের চামড়া স্থিতিস্থাপক, তাই তা কুঁচকানো অবস্থাতেই থেকে যায় আঙুরের গায়ে। কিন্তু চাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। চন্দ্র-ত্বক স্থিতিস্থাপক নয়। এটি ভঙ্গুর। তাই চাঁদের আকার ছোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র-ত্বক না কুঁচকে ভেঙে যায়। চন্দ্র-ত্বকের এক অংশ উঠে যায় পাশে অন্য অংশের উপর। ঘটনাটিকে বলা হয় 'থ্রাস্ট ফল্ট'। চন্দ্র-পৃষ্ঠ কুঁচকে গিয়ে তৈরি করে খাড়াই সিঁড়ির মতন খাঁজ। সাম্প্রতিক এই গবেষণায় দাবী করা হচ্ছে যে, চাঁদ ক্রমশ তার তাপমাত্রা হারিয়ে ঠান্ডা হতে হতে কুঁচকে যাচ্ছে। ঘটছে থ্রাস্ট ফল্ট এবং চন্দ্র-কম্পণ। এরকম চন্দ্র-কম্পণের কোন কোনটির তীব্রতা রিকটার স্কেলে পাঁচ-এর সমানও হয়ে থাকে।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ সাল। এই সময়কালে চাঁদে পাঠানো হয়েছিল অ্যাপোলো মহাকাশযান ১১, ১২, ১৪ এবং ১৬। এসব মহাকাশযানের মাধ্যমে নভঃশ্চারীরা চাঁদের বুকে বসিয়েছিল বেশ কয়েকটি সিস্মোমিটার যন্ত্র। সিসমোমিটার হল এমন যন্ত্র যার সাহায্যে ধরা যায় কোন কম্পণের উৎস, তার শক্তির পরিমাণ, কম্পণ সৃষ্টির সময় ইত্যাদি তথ্য। চাঁদে বসানো সিস্মোমিটারগুলি থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রায় আঠাশটি চন্দ্র-কম্পণের অস্তিত্ব ধরা গেছে যাদের মাত্রা দুই থেকে পাঁচ রিকটার স্কেলের সমান যা হওয়া স্বাভাবিক চন্দ্র-পৃষ্ঠে থ্রাস্ট ফল্টের কারণে। আর এই আঠাশটির মধ্যে আটটি কম্পণ ঘটেছিল থ্রাস্ট ফল্ট এলাকার ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে যা স্পষ্ট ধরা পড়েছে চাঁদের ছবি থেকে।

শুধু অ্যাপোলো মিশন থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই চাঁদের সঙ্কোচনের ব্যাপারটিকে মেনে নেওয়া হয়নি। যাচাই করা হয়েছে আরও একটি দিক থেকে। আর এর জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে 'লুনার রিকনয়সান্স অরবাইটার'-এর। লুনার রিকনয়সান্স অরবাইটার বা এল আর ও হল ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস্ অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা প্রেরিত এক রোবটিয় মহাকাশযান যা চাঁদকে ঘিরে তার চারপাশে

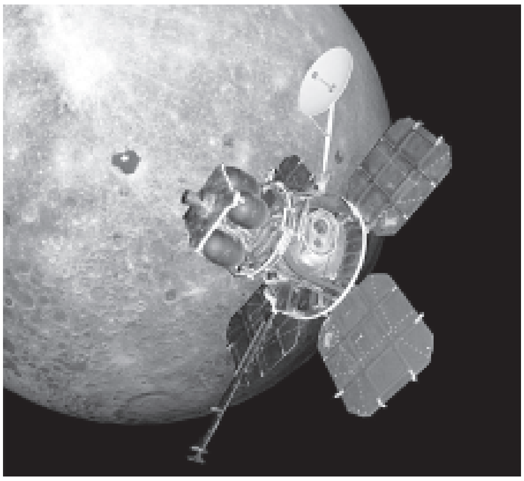

লুনার অরবাইটার

ঘুরছে সেই ২০০৯ সাল থেকে। চন্দ্র-পৃষ্ঠের নিখুঁত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি এবং তথ্য প্রেরণ যার কাজ। চন্দ্র-পৃষ্ঠের সামান্য কিছু অংশ বাদে বাকি সমস্ত অংশের চন্দ্র-মানচিত্র তৈরি করে ফেলেছে এল আর ও। বিশেষ করে অ্যাপোলো যানগুলির চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণের স্থানগুলোকে নিখুঁত ভাবে চিত্রাকারে তুলে এনেছে এল আর ও। চন্দ্র-পৃষ্ঠে কম্পণ এবং তার ফলে ধ্বংসের ঘটনা আজও যে ঘটে চলেছে তার প্রমাণ মিলেছে এল আর ও-এর ক্যামেরাবন্দি চিত্রে। প্রায় ৩৫০০টি এরকম ছবিতে দেখা গেছে থ্রাস্ট ফল্টের প্রমাণ। যেখানে ধস নামা অংশের অপেক্ষাকৃত বেশি ঔজ্জ্বল্য সাম্প্রতিক ঘটনারই প্রমাণ দেয়। কারণ সূর্য বা মহাকাশ থেকে আসা বিকিরণের দরুণ চন্দ্রপৃষ্ঠের যাবতীয় জিনিসের ঔজ্জ্বল্য কমে যায় অনেকটাই। তাই ধসগুলি যদি অনেকদিন আগের হত তা এত চকচকে থাকত না। ম্লান হয়ে যেত অনেকটাই। সাম্প্রতিক ছবিগুলোর চাকচিক্যই প্রমাণ করে চন্দ্রপৃষ্ঠের সঙ্কোচন এবং তার ফলে চন্দ্র-কম্পণের সাম্প্রতিক ঘটনা।

M. 9477934928, email : rdebnath1961@gmail.com

<u>সংবাদ</u>

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

বিজ্ঞান প্রচারেও এগিয়ে বাংলা

সারা দেশের মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞান সংস্কৃতিতে উনবিংশ শতক থেকেই এগিয়ে রয়েছে বাংলা। এই বাংলাতেই (পড়ুন কলকাতায়) প্রথম (১৭৭৬ সালে) বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌজন্যে প্রখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতী মহেন্দ্রলাল সরকার। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রণী ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যর মত সমাজ সচেতন গবেষকরা। তা এ হেন বংলার বিজ্ঞান মননকে সম্মান জানিয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্প্রচার ও প্রসারে আরও উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা 'বিজ্ঞান প্রসার'। সম্প্রতি (২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল) তারা যাদবপুরে অবস্থিত সেন্ট্রাল গ্লাস ও সেরামিক ইনস্টিটিউট-এর মেঘনাদ সাহা সভাগৃহে আয়োজন করেছিল 'বাংলায় বিজ্ঞানপ্রচার জনপ্রিয়করণ ও প্রসার ভবিষ্যতের পথ'-শীর্ষক এক আলোচনা সভার। দু দিন ব্যাপী এই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলার নামী বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধার ও মিউজিয়ামের কর্তারা, বিজ্ঞানকর্মীও ও সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা এবং বিজ্ঞান লেখকরা। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর 'আউটরীচ প্রোগ্রাম'-এর খতিয়ান যেমন উঠে এল, সাধারণ মানুষ ও পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্প্রচারে মিউজিয়ামের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও সবিস্তারে আলোচিত হল। জানা গেল 'বিজ্ঞান প্রসার' সংস্থা বর্তমান প্রজন্মের পড়ুয়াদের আরও বিজ্ঞানমুখী করতে ডিজিটাল মিডিয়াকে কাজে লাগাতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

আগামীদিনে 'এনগেজ' নামক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে পড়ুয়ারা সরাসরি যুক্ত হয়ে প্রশ্নোত্তরে অংশ নিতে পারবে। 'ডি ডি বাংলা'-র ১ ঘণ্টা ব্যাপী বিজ্ঞান সম্প্রচারের পাশাপাশি 'ইন্ডিয়া সায়েন্স নামে একটি চ্যানেল চালু করা হয়েছে যা কম্পিউটার বা মোবাইলে দেখা যাবে। দিনের যেকোনও সময়ে মিলবে তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ। নতুন করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে 'বিজ্ঞান প্রসার' যে সত্যিই আন্তরিক—তার পরিচয় মিলল সংস্থার অধিকর্তা ড. নকুল পরাশর-এর বক্তব্যে। বাংলা ভাষায় কথা বলা ৯ কোটি ৭০ লক্ষ ভারতবাসীর কথা মাথায় রেখে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের কাজে বাংলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গও উঠল। 'বিজ্ঞান প্রসার' পরবর্তীতে এইভাবে মারাঠী ও তামিল ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারে মনোযোগী হবে। জ্যোতিষচর্চা প্রসারে মগ্ন একাধিক চ্যানেলের বাড়বাড়ন্ত দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন 'বিজ্ঞান প্রসার'-এর এই উদ্যোগের নেপথ্য কাণ্ডারী ড. রিন্টু নাথ। বিজ্ঞানের বিস্ময় এখনকার পড়ুয়াদের কেন আকর্ষণ করতে পারছে না, সে ব্যাপারে তিনি সবাইকে ভাবতে পরামর্শ দেন।

স্কুল পড়ুয়াদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রথম (১৯৫৯ সালে) বিড়লা মিউজিয়াম তৈরি হয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের উদ্যোগে এই কলকাতাতেই। পরবর্তীতে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স মিউজিয়ামের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মিউজিয়াম, সায়েন্স সিটি ও বিভিন্ন জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলো বিজ্ঞানপ্রসারে রত আছে। সত্তর ও আশির দশকে তৈরি হওয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান সংগঠনগুলো বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী, ম্যাজিক দর্শন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার, জলে আর্সেনিকের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের সমীক্ষা ও বিজ্ঞান ক্যুইজের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান মেলা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির এবং জলাশয় বোজানোর প্রতিরোধ. বৃক্ষচ্ছেদনে প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপনে উৎসাহদান, পদযাত্রা (জাঠা), পথ-সভা, স্মারকলিপি পেশ ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ তথা পরিবেশ সচেতনতার কাজকে বিজ্ঞান আন্দোলনে রূপ দিয়েছে। বাংলায় বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমেও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে।

বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার ও জনপ্রিয়করণে বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান লেখক ও সংগঠনগুলো প্রস্তাব পেশে ছিল যথেষ্ট আন্তরিক। বিজ্ঞান সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি যেমন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উঠে এল, তেমনি বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে গিয়ে শিল্প সাহিত্য, সঙ্গীত খেলাধূলার জগতের মানুষদের নিয়ে 'আড্ডা'র আবহে বিজ্ঞানচর্চার প্রস্তাবনা সাধুবাদ পেল। সামগ্রিকভাবে জনমানসে বিজ্ঞান মনস্কতা বিকাশের মাধ্যমে বিজ্ঞানের মেজাজ ও অনুসন্ধিৎসার মত সংবিধানের ৫১এ ধারার এইচ উপধারায় উল্লিখিত আমাদের 'মৌলিক কর্তব্য'-র প্রচার ও প্রসার হোক বিজ্ঞান প্রসারের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী, এই আশা নিয়ে শেষ হল এবারের সম্মেলন।

M. 9231533335, email : joardar69@gmail.com

বি জ য় স র কা র

জানো কি?

❑ **উদয় ও অস্তের সময় সূর্যকে লাল দেখায় কেন?**

উদয় ও অস্তের সময় সূর্য থাকে দিগন্তরেখার কাছে। সেই সময় আমরা সূর্যকে লাল বা কমলা রঙে দেখি। এই ঘটনার জন্য দায়ী আলোর বিপেক্ষণ (যখন কোনো আলোকতরঙ্গ কোনো ক্ষুদ্র কণার উপর পড়ে, তখন কণাগুলি আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ বা Scattering of Light)। বিপক্ষণের জন্যই বিভিন্ন রঙের উদ্ভব ঘটে। সূর্যের আলো রামধনুর সবকটি রঙ নিয়ে তৈরি। প্রতিটি রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা Wave Length (পরপর দুটি তরঙ্গ চূড়া বা তরঙ্গ খাঁজের মধ্যবর্তী দূরত্ব হল তরঙ্গদৈর্ঘ্য) আলাদা আলাদা। বেগুনি রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম, লাল রঙের সবচেয়ে বেশি। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হলে বিক্ষেপণ বেশি হয়, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হলে বিক্ষেপণ হয় কম। আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে আছে জলীয় বাষ্প, ধুলোবালি ও নানা গ্যাসীয় কণা। আলোর বিক্ষেপণে এদের ভূমিকা আছে। উদয় ও অস্তের সময় সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে অনেকটা বাঁকাভাবে। ফলে দিনের তুলনায় অনেক বেশি পুরু বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে আসতে হয়। পুরু বায়ুমণ্ডলের অর্থ বেশি কণার উপস্থিতি ও বেশি বিক্ষেপণ। নীল, বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়ায় পৃথিবীতে প্রবেশের সময় বাতাসের ধূলোকণা, জলকণা দ্বারা বেশি বিক্ষেপিত হয় এবং আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল, কমলা আলোকরশ্মি কম বিক্ষেপিত হয়ে সরাসরি আমাদের চোখে এসে পড়ে। আমরা দেখি লাল আকাশ।

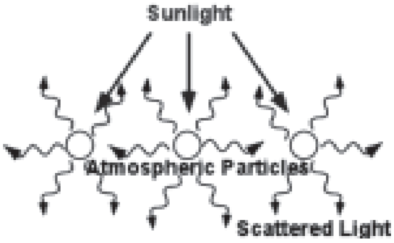

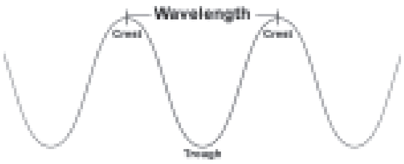

M. 9432335882

শব্দের খোঁজে ৯ : সমাধান পলক বন্দ্যোপাধ্যায় • M. 9903424119

১ পা			২ জে	না	৩ র			
উ			ম		৪ স	৫ ল্	ক	
৬ লি	৭ নি	য়া	স			রে		৮ ক
	উ			৯ স্টি	ফে	ন	শ	ন
	ট			ফে		স		রা
১০ হা	ন		১১ জ	ন			১২ গ	৫
ই			র্ড		১৩ বে	য়া	র্ড	
১৪ জে	ম	স	ন		কা		ন	
ন				১৫ বো	র	ন		

অনাহূত

জগন্ময় মজুমদার

বিনা আমন্ত্রণে তুই ছাড়া আর কে আসে,
জন্ম-অনাহূত।

নদী তো দু'পাড় ভাঙে আর তুই সব পারাপার।

কথা নেই বার্তা নেই ভেঙে দিস
গাছপালা, বাড়িঘর।

একলা আসে না বৃষ্টি, সঙ্গে মস্তান ঝড়।

ধস নামে পাহাড় ছাড়াও, শেয়ারবাজারে,
সংসারে।

ফণা তুলবার আগে ছোবল মারিস।

হাজারো দাঁতাল হারে তোর ব্যবহারে
অথচ আমরা কি বোকা
তোকে তাড়াতে রাত জাগি, মিথ্যে অহঙ্কারে।

পত্রিকা যোগাযোগ

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) •

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ • সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস
e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak